মাসিক

মোহাম্মদী

সম্পাদক :

মুজীবুর রহমান খাঁ

সূচীপত্র—আশ্বিন, ১৩৬৬

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
প্রবন্ধ :		
১। বাকেরগঞ্জের কথা	—মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী	৮৯৩
২। পলাশপুরের ইতিকথা	—আলবেরুনী	৮৯৮
৩। সাহিত্যে অশ্লীলতা	—মীর আবুল হোসেন	৯০৪
৪। একেই কি বলে ইতিহাস ?	—আকবর আলী খান	৯১৬
৫। সাহিত্য ও জাতীয়তা	—অধ্যাপক জিয়াউদ্দীন আহমদ	৯১৯
৬। মতীয়র রহমান খাঁর রসরচনা	—মহীউদ্দীন	৯২৮
৭। বহুবিবাহের কারণ ও বর্ত্তমান মনোভাব	—মোহাম্মদ মোর্তজা	৯৪১
৮। পল্লীসাহিত্যে প্রেম	—মীর আলতাফ আলী	৯৫১
কবিতা :		
১। যাযাবর পাখী	—আ. ন. ম. বজলুর রশীদ	৮৯৭
২। যোগাযোগ	—আ. কা. শ. নূর মোহাম্মদ	৯০৬
৩। একটি অনুভূতি	—দীন্ আফরোজ আহমদ	৯১৫
৪। সকালে	—জুলফিকার মতিন	৯৩৮
৫। ভেজা কান্না	—আলমগীর জলীল	৯৬৫
গল্প-নাটিকা :		
১। মেঘ ও মাটি	—জ্যোৎস্নেন্দু চক্রবর্ত্তী	৯১২
২। সঙ্গম-তীর্থ	—নূরুল ইসলাম খান	৯৩১
৩। বিপ্রলব্ধা	—হাসিব চৌধুরী	৯৪৬
৪। ভৌতিক	—আমিনুল ইসলাম	৯৫৩
স্মৃতি-কথা		
১। বাতায়ন	—ইব্রাহিম খাঁ	৯০৭
বিবিধ		
১। খেলাধূলা	—খেলোয়াড়	৯৫৬
সম্পাদকীয় :		
১। আলোচনা	... ...	৯৫৯

আপনার শিশুর জন্য ঘাবড়াবেন না

কারণ সে "ল্যাক্টোজেন" বেবী ফুড পান করে

মাতৃদুগ্ধ যখন না থাকে আপনি বিনা দ্বিধায় ল্যাক্টোজেনের উপর ভরসা করতে পারেন।

ইংরেজী ভাষায় মুদ্রিত ৮৭ পৃষ্ঠার এক মনোরম সচিত্র পুস্তিকা "ল্যাক্টোজেনের মাদার বুক" বিনামূল্যে প্রাপ্তির জন্যে পার্শ্বের কুপনে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখে ডাক খরচের একাংশের জন্যে মাত্র দুই আনার ডাক টিকেট সহ এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন :–

নাম ....

ঠিকানা ....

....

"লিপটন (পাকিস্তান) লিমিটেড, তাজ বিল্ডিং, ৬, জিন্নাহ এভিনিউ, রমনা, ঢাকা

মাসিক মোহাম্মদী

আশ্বিন, ১৩৬৬
৩০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

বাকেরগঞ্জের কথা

মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী

দুর্গম যাতায়াত ব্যবস্থার দরুনই বাহিরের লোকেরা জিলাটির এ-বিরাট অঞ্চলের সহিত সবিশেষ পরিচিত নন। তাহারা মনে করেন যে সমগ্র জিলাটা নদী-নালা, সমুদ্র ও অরণ্য-বেষ্টিত এক অনগ্রসর ভূ-খণ্ড বই আর কিছুই নয়। আসলে তাহাদের এ-জাতীয় ধারণা অজ্ঞতা ও ভুলের উপরই প্রতিষ্ঠিত। এ-অঞ্চলের এক বিরাট ও গৌরবময় ইতিহাস রহিয়াছে—আছে হিন্দু-মুসলিম অতীত কীর্তির সহস্র নিদর্শন

সুদূর অতীতে এ-সমগ্র অঞ্চলই দক্ষিণের সমুদ্র এবং জিলার পশ্চিম-মধ্য ভাগে প্রবাহিত সুন্ধা বা সুগন্ধা নামক বৃহৎ নদীর গর্ভে নিমজ্জিত ছিল বলিয়া অনুমিত হইতেছে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা বহিত পলিমাটির দ্বারা ক্রমাগত এ-ভূ-ভাগের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।

কখন কি ভাবে যে এই নিম্নাঞ্চলে মানুষের বসতি বিস্তার হয় তা সঠিক বলা যায় না। প্রাচীনতর অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরা এ-অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াছিল কিনা তাহাও আমরা বলিতে পারি না। ডাঃ জেমস ওয়াইজ প্রমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে জালো ও মালো প্রভৃতি কৈবর্ত জাতীয় লোকেরা নাকি পূর্ব-বাঙলার অন্যতম আদিম জাতি। এ-অভিমত সত্য হইলে এখানকার হালিয়া দাস, জালিয়া দাস এবং নমোশূদ্রদের পূর্ব-পুরুষগণকেই আমরা এই নিম্নদেশের আদিম অধিবাসী বলিয়া মানিয়া লইতে পারি। দ্রাবিড়, আর্য অথবা তৎপূর্ববর্তী কোনো সবলতর জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া যীশু-পূর্ব জামানাতেই হয়তো তাহারা তৎকালীন এ-অরণ্যাঞ্চলে হিজরত করিয়া থাকিবে।

কাহারা যে এখানে সর্বপ্রথম উন্নততর সভ্যতার প্রচার করেন তাহাও সঠিক নির্ণয় করা যাইতেছে না। ফা-হিয়েন ও হিউ-এন্-স্যাং প্রমুখ চীনা পরিব্রাজকদের বিবরণী হইতেও আমরা প্রদেশের এ-অঞ্চল সম্পর্কে কিছুই অবগত হইতে পারিতেছি না। তাহারা যে প্রাচীন সমতট বা পূর্ব-বাঙলার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে এ-অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি অবশ্যই বুঝাইতেছে না। প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিকগণ অথবা পরবর্তীকালের পাশ্চাত্য লেখকগণও এসম্পর্কে আলোকপাত করিতে পারেন নাই। ঈশায়ী নবম কি দশম শতকে চাটগাঁও অঞ্চলে আরবীয় মুসলমানদের আগমন ও বসতি স্থাপন ঐতিহাসিক সত্য হইলেও প্রাচীন বাকেরগঞ্জ অঞ্চলের কোথাও আরবেরা অবতরণ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না। এরূপ ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর বিচার-বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা একমাত্র অনুমান করিতে পারি যে ঈশায়ী দশম ও একাদশ শতকে বাঙলার বৌদ্ধ শাসন যুগে জিলার উত্তরাঞ্চলে উন্নততর সভ্যতার সংস্পর্শ ঘটিয়া থাকিবে। পরবর্তীকালে সোনারগাঁয়ে সেন রাজাদের শাসনকালেই এই সভ্যতা দক্ষিণে সমুদ্র তীর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এ-জিলার কাশীপুর, শিকারপুর ও সোনাবালিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন পীঠস্থান ও মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠাকালও এ-সময়ই।

ঈশায়ী ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে বিন বখ্‌তিয়ার

কর্তৃক গৌড়-বঙ্গ বিজয়ের পর সেনরাজাগণ বিক্রমপুরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু নবাগত ইস্‌লাম ও মুস্‌লিম শক্তির দ্রুত বিস্তৃতি আশঙ্কা করিয়া এখানেও তাহারা উদ্বেগ বোধ করিতে থাকেন। তাই এই ক্ষয়মান রাজা-বংশের জনৈক উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে জিলার নিম্ন-দক্ষিণে এক স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইস্‌লাম ও মুসলিম সভ্যতার সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ এড়াইয়া নিরাপদ দূরে হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার সবল সংরক্ষণই ছিল রাজকুমার দনুজমর্দ্দন এবং রাজগুরু চন্দ্রশেখরের প্রকৃত উদ্দেশ্য। রাজপুরোহিত চন্দ্রশেখরের নামানুসারেই এই প্রাচীন রাজ্যের নাম চন্দ্রদ্বীপ হইয়া থাকিবে। মুগল আমলে ইহা ইস্‌মাঈলপুর বা সরকার বাক্‌লা নামে অভিহিত হয়। বর্তমান বাউফল থানা এলাকার দক্ষিণ-পূর্বদিকে তেতুলিয়া তীরবর্তী কচুয়া নামক স্থানে এই রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। তৎকালীন ঐতিহাসিকগণ উক্ত রাজধানীকে বাক্‌লা বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ঈসায়ী ১৫৮৬ সনে ইংরাজ ভ্রমণকারী র‍্যাল্‌ফ ফিচ (Ralph Fitch) রাজধানী বাক্‌লা পরিদর্শন করেন। তাহার বর্ণনায় জানা যায় যে বাক্‌লা রাজ্য তখন ফুল-ফসল এবং স্থতী ও রেশমি বস্ত্রাদিতে ভরপুর ছিল। ঈসায়ী ১৫৮৪ সনের প্লাবনে রাজ্যের প্রায় দুই লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় বলিয়া আইন-ই-আকবরী নামক প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।

এভাবে দক্ষিণাঞ্চলে একটি হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় এখানে ক্রমান্বয়ে উচ্চ বর্ণের হিন্দুগণ আগমন করিতে থাকেন। রাজধানী বাক্‌লাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং অন্যান্য জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিগণ সমাদৃত হইতেন। তৎকালে বাক্‌লার পণ্ডিতদের খ্যাতি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ছিল। রাজধানী বাক্‌লা নগরী দীর্ঘদিন পূর্বেই তেতুলিয়া নদীর গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উহার নিকট-বর্তী অঞ্চল সমূহে আজো পুরাতন ইট-পাথর এবং ভগ্ন ইমারতাদির নিদর্শন দৃষ্ট হইতেছে। এখানকার 'কমলার-দীঘি' আজো কায়স্থ রাজকুমারী কমলার জনকল্যাণকর কীর্তি কথা ঘোষণা করিয়া বিরাজিত। এছাড়াও তৎকালীন হিন্দু সভ্যতার স্বাক্ষর আঁকা রহিয়াছে জিলার সর্বত্র। এই কায়স্থ রাজবংশীয়গণ আজো উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত পরবর্তীকালীন রাজধানী মাধব পাশাতে অতিশয় দারিদ্র্য-পীড়িত অবস্থায় দিনপাত করিতেছেন।

এ-অঞ্চলে কখন যে সর্বপ্রথম মুসলমানেরা আগমন করেন তাহার সঠিক কাল নির্ণয় করিতেও আমরা অক্ষম। অনেকে অনুমান করেন যে বখ্‌তিয়ার-পূর্ব জামানাতেই জিলার উত্তরাঞ্চলে ইস্‌লাম-প্রচারক দরবেশগণ আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এ-অনুমানের সমর্থনে আজো কোনো প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এ-অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রাচীন মস্‌জিদ, মাজার ও সড়কাদি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে নির্মিত হইয়াছে বলিয়াই বরং প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মশ্‌হুর মুসাফীর ইব্‌নেবতুতা এবং পর্তুগীজ ভ্রমণকারী বার্বোসার সফরনামায় দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে মুস্‌লিম প্রাধান্যের উল্লেখ থাকিলেও উহার দ্বারা প্রাচীন বাক্‌লা বা বাকেরগঞ্জ এলাকার কোনো স্থানকে অবশ্যই বুঝাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে গৌড়বঙ্গে তুর্কী সুলতানাত প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেই এ-অঞ্চলে ইস্‌লামের বিস্তৃতি ঘটে। ঈসায়ী চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে আগত দরবেশ সাইয়েদুল-আরেফীন সাহেবই সর্ব প্রথম এই নিম্নাঞ্চলে ব্যাপক ভাবে ইস্‌লাম প্রচার করেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মধ্য এশিয়া হইতে আগত ভারত-আক্রমণকারী বীর তৈমুর লঙ্গ কর্তৃকই তিনি এ অঞ্চলে প্রেরিত হন। জিলার দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে কালিগুরী নামক স্থানে আজো তাঁহার দরগাহ্‌ বাড়ী বিদ্যমান।

ঈসায়ী ১৪৬৫ সনে বাক্‌লা রাজ্যের সর্ব-দক্ষিণে বর্তমান মস্‌জিদ বাড়ী নামক স্থানের প্রাচীন ও বৃহদাকার মস্‌জিদটি নির্মিত হইয়াছে বলিয়া সংলগ্ন শিলালিপি পাঠে জানা যাইতেছে। আরো জানা যাইতেছে যে তৎকালীন গৌড়াধিপতি আবুল মোজাফ্ফর বারবেক শাহ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া খান মোয়াজ্জেম ওয়াজিয়াল খাঁ কর্তৃক উহা নির্মিত হয়। বস্তুতঃ ঈসায়ী চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে গৌড়ের স্বাধীন সুলতানদের উৎসাহ এবং অর্থানুকূল্যে বহু পীর-দরবেশ নিম্ন ভাটির বহু স্থানে ইস্‌লাম প্রচার করেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে খুলনা বাগেরহাট অঞ্চলে সমাহিত পীর খাঁ জাহান আলী, ফরিদপুরের ফরিদ শাহ, সিলেটের পীর শাহ্‌ জালাল এবং সন্দ্বীপে সমাহিত পীর বখ্‌তিয়ার মৈস্তর প্রমুখ ব্যক্তিগণ এ-সময়কারই ইস্‌লাম প্রচারক ছিলেন। সুতরাং আমাদের আলোচ্য বাক্‌লা রাজ্য বা প্রাচীন বাকেরগঞ্জের সর্বত্রই যে এ-সময় মধ্যে ইস্‌লামের বিস্তার হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা যাইতে পারে।

এ-সকল পীর-দরবেশগণের সহিত তাহাদের অনুরক্ত বাহিরের বহু মুসলমানও এ-সময় এ-অঞ্চলে আগমন করিয়া থাকিবেন। তাহাদের এবং স্থানীয় নবদীক্ষিতদের বসবাস এবং জীবিকার ব্যবস্থাও এ-সকল দরবেশগণই করিয়া দিতেন। ফলে এ-সময় হইতে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া নিত্য নতুন জমি চাষে আনিবার কার্যও অগ্রসর হয়। প্রকাশ, পীর খাঁ জাহান আলি নাকি ভাটি এলাকার

জঙ্গল কাটিবার জন্য এককালীন ৬০ হাজার লোক নিয়োগ করিয়াছিলেন। এদেশে ইস্‌লাম বিস্তৃতির অন্যবিধ কারণ বিদ্যমান থাকিলেও এ-সকল পীর-দরবেশদের বিরামহীন প্রচেষ্টায়ই উহা সর্বাধিক ব্যাপকতা লাভ করে। ফলে এই প্রাচীন হিন্দু রাজ্যে আজ লাখ লাখ মুসলমানের বাস। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম ও সভ্যতার পাশাপাশি আজ দেখিতে পাই ইস্‌লাম ও মুস্‌লিম সভ্যতার ব্যাপক বিকাশ।

ষোড়শ শতকের শেষভাগে পর্তুগীজ মিশনারীদের দ্বারা এ-অঞ্চলে ঈসায়ী ধর্মের প্রচার শুরু হয়। ঈসায়ী প্রচারকগণ আজো এব্যাপারে তৎপর আছেন। আজ এ-জিলায় শিক্ষা প্রচার ও সমাজ সেবার ব্যাপারে তাহাদের দান আমরা বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি।

এ-জিলার নিম্নভাগে কয়েক হাজার বৌদ্ধ বা মগ অধিবাসী বাস করিতেছেন। প্রাচীন কালে আরাকানী মগ দস্যুগণ এ-দেশে লুট-পাট করিয়া বেড়াইত। তাই অনেকে অনুমান করেন যে বর্তমান মগ অধিবাসীগণ ঐ সকল দস্যু-তস্করদেরই বংশধর। কিন্তু এরূপ ধারণার মূলে কোনো ঐতিহাসিক সমর্থন পাওয়া যাইতেছে না। বরং ইংরাজ আমলে নিম্নভূমির জঙ্গল কাটিয়া চাষ আবাদ করিবার জন্যই যে তাহাদিগকে এখানে আনয়ন করা হইয়াছে। তাহারই বিশ্বাস্য প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। তাহারা নিম্নাঞ্চলের সরল ও পরিশ্রমী চাষী।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা জিলার বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করিলাম। এক্ষণে আমরা আমাদের মূল আলোচনার বিষয় চলিয়া যাইব। ঈসায়ী ১৫৭৪ সনে মুগল সেনানায়ক মুরাদ খাঁ এই প্রাচীন কায়স্থ রাজ্যটি অধিকার করেন। তখন ইহা সুবে বাঙলার অন্যতম সরকার রূপে মুগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রেও দেশ শাসনের ভার স্থানীয় রাজার হাতেই ন্যস্ত থাকে। ঈসায়ী সপ্তদশ শতকের শুরুতে বাকলা বা চন্দ্রদ্বীপের রাজশক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে এবং এই সুযোগে আরাকানী মগেরা এদেশ অধিকার করে। বালক রাজা রামচন্দ্র এ-সময় তাহার শ্বশুর যশোর-পতি রাজা প্রতাপাদিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বয়োঃ-প্রাপ্ত হইয়া পরে তিনি স্বীয়রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর রাজ শক্তি আবার দুর্বল হইতে থাকে। ফলে মগ এবং সন্দীপে অবস্থিত ফিরিঙ্গী দস্যুগণ দেশ মধ্যে বে-পরোয়া জুলুম আরম্ভ করিয়া দেয়। তাই সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে বৃদ্ধ সম্রাট শাহ্‌জাহান তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শাহ্‌জাদা শূজাকে সুবাদার নিযুক্ত করিয়া মগ ও ফিরিঙ্গী দমনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

শাহ্‌জাদা শূজা দীর্ঘ দিন এ-অঞ্চলে অবস্থান করেন। ইতঃপূর্বে অন্য কোনো মুগল শাহজাদা সুবাদার বা উচ্চ-রাজ কর্মচারী বাক্‌লা বা প্রাচীন বাকেরগঞ্জ এলাকায় এরূপ দীর্ঘদিন ধরিয়া অবস্থান করেন নাই। বাকেরগঞ্জের মূল ভূখণ্ড হইতে দস্যুদলকে তাড়াইয়া তিনি দেশে শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে বহু রাস্তা ঘাট, সৈন্য ছাউনী ও কিল্লাদি নির্মাণ করেন। এ-জিলার শূজাবাদ মৌজা এবং ঐ নামীয় বৃহত কিল্লা আজো এই মুগল শাহ্‌জাদার বীরত্বের প্রতীক বহিয়া বিদ্যমান। স্থানীয় জনশ্রুতি হইতে জানা যায় যে অদূরে অবস্থিত মানপাশা কাজীবাড়ীর প্রাচীন মস্‌জিদটি এ-সময় তাঁহারই আদেশে নির্মিত হইয়াছিল।

অতঃপর পীড়িত সম্রাট শাহ্‌জাহানের শেষ জীবনে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মীর জুমলা কর্তৃক শূজা বাঙলা দেশ হইতে বিতাড়িত হন। সাম্রাজ্যিক অন্তর্বিপ্লবকালীন এ-সময়টাতে অন্যান্য স্থানের ন্যায় সরকার বাক্‌লাতেও মুগল শাসন শিথিল হইয়া পড়ে। ফলে পঙ্গপালের ন্যায় মগ ও ফিরিঙ্গী দস্যু দল আবার ভাটি বাক্‌লার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সময় সময় তাহারা রাজধানী জাহাঁগীর নগর পর্যন্ত ধাওয়া করিত। এ-ব্যাপারে সম্রাট আওরঙ্গ-জেব উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। তিনি বিখ্যাত যোদ্ধা নওয়াব শায়েস্তা খাঁকে অবিলম্বে বাঙলার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন। ১৬৬৬ ঈসায়ী সনে নৌসেনা-পতি ইব্‌নে হোসেন বেগের নেতৃত্বে দক্ষিণ মেঘনায় নৌ অভিযান প্রেরিত হইল। স্থলবাহিনীর ভার অর্পিত হইল শায়েস্তা খাঁর পুত্র বুজর্গ উমেদ খাঁর প্রতি। মেঘনার যুদ্ধে সন্দীপ মুগলদের হস্তগত হয় এবং উভয় বাহিনী সম্মিলিত হইয়া চাঁটগাও অধিকার করে। এভাবে আওরঙ্গজেবের নির্দেশে ভাটি বাক্‌লার মগ ও ফিরিঙ্গি জুলুম স্তব্ধ হইয়া যায়। যথাক্রমে সম্রাট, সুবাদার, এবং সুবাদার পুত্রের নামানুসারে এ-জিলার আওরঙ্গ পুর, শায়েস্তাবাদ ও বুজর্গ উমেদপুর পরগণাত্রয়ের নাম করা হইয়াছে। মেঘনা বিজয়ী নৌ সেনাপতির নামে কোনো স্থানের নামকরণ হইয়াছে কিনা তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে এ-জিলায় হোসেনপুর নামে কয়েকটি মৌজা দৃষ্ট হইতেছে।

জিলার বাকেরগঞ্জ নামকরণ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী-কালেই হইয়াছিল। নওয়াব আলীবর্দীর শাসন আমলে আগা বাকের খাঁ নামক এক পরাক্রমশীল ব্যক্তি ভাটি অঞ্চলে বৃহত জমিদারী লাভ করেন। বর্তমান বাকেরগঞ্জ বন্দরটি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। এখানকার প্রাচীন মসজিদ, জলাশয় ও অন্যান্য পুরাতন নিদর্শনাদি হইতে অনুমিত হয় যে এককালে এখানে বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমানের বসবাস ছিল। নওয়াব আলীবর্দীর শেষ জীবনে মুর্শীদাবাদের

অন্তর্বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া আগা বাকের খাঁ ঢাকাতে নিহত হন। ফলে তাঁহার বিরাট জমিদারী ধূর্ত রাজবল্লভ গ্রাস করিয়া লইলেন। এই বাকেরগঞ্জ বন্দরেই বহুদিন ধরিয়া জিলা-সদর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ঈসায়ী ১৮০১ সনে জিলা-সদর বরিশাল নামক তৎকালীন ক্ষুদ্র বন্দরে আনীত হয়। বলা বাহুল্য যে, আগা বাকের প্রতিষ্ঠিত বাকেরগঞ্জ বন্দর হইতেই জিলার এরূপ নামোৎপত্তি হইয়াছে।

নদীতীরবর্তী বরিশাল বন্দরটিও পুরাতন। প্রাচীন-কালে ইহা লবন ব্যবসায়ের কেন্দ্র স্থলরূপে বিবেচিত হইত। তখন ইহাকে 'গিদে'-বন্দর' বা বন্দর-এলাকা বলা হইত। শহরতলীর আমানতগঞ্জ, কাউনিয়া, কাশীপুর, শাপানিয়া ও পুরাণপাড়া প্রভৃতি স্থানের পুরাতন মসজিদ, মাজার ও মন্দিরগুলি এবং শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ফকিরবাড়ীর সুদৃশ্য মসজিদটি প্রাচীন কালেই নির্মিত হইয়াছিল। 'বিবির মহল্লা' ও 'বিবির তালাব' পুরাতনেরই স্মৃতি।

বহুমুখী বিশৃঙ্খলার মধ্যেই ইংরাজ কোম্পানী দেশের শাসন ভার হাতে নিয়েছিল। মগ-ফিরিঙ্গীর জুলুম এবং বানবন্যার ফলে এ অঞ্চল প্রায় জনমানবহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ভাষাপরিবর্তন, সূর্যাস্ত আইন, লাখেরাজ বাজেয়াপ্তী এবং প্রজাপীড়ক ভূমিস্বত্ব বিধির পরিণাম এ জিলাকে স্পর্শ করিয়াছিল। নীলকর, লবণকর এবং জমিদারী জুলুমকে কেন্দ্র করিয়া এ অঞ্চলে চাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় ওহাবী বিপ্লবের বিদ্রোহ তরঙ্গও এ জিলায় প্রকাশ পাইয়াছিল। এদেশে ইহা ফরাইজী আন্দোলন নামে খ্যাতিলাভ করে। হাজী শরীয়াতুল্লার নেতৃত্বে এ-আন্দোলন প্রথমতঃ জিলার উত্তরাঞ্চলে আরম্ভ হয় এবং পরে অন্যান্য অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত হয়।

অতঃপর বিশ শতকের প্রথম দিকে অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে 'স্বদেশী ও বয়কট' আন্দোলন এ-জিলাকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। ঈসায়ী ১৯০৮ সনে মিঃ এ, রসুলের সভাপতিত্বে এখানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ১৯১৬ সনে এখানে প্রাদেশিক মুসলিম শিক্ষা ও সাহিত্য সম্মেলনের এক অধিবেশন হইয়াছিল। পুনরায় ১৯২১ সনে এখানে প্রাদেশিক রাজনৈতিক সম্মেলনের অধিবেশন বসে এবং ১৯২৭ সনে স্যর আবদুর রহিমের সভা নেতৃত্বে আহুত হয় প্রাদেশিক মুসলিম সম্মেলন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন, জনাব ফজলুল হকের প্রজা আন্দোলন এবং মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলন এ-জিলাকে এক গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে।

ছায়া-ঢাকা পাখী ডাকা নদী-বেষ্টিত বিচ্ছিন্ন বাকের-গঞ্জ একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও সভ্যতার অধিকারী। এ-দেশের মেঘনা, তেতুলিয়া, বিশখালি, বলেশ্বর ও কালাবদরের কলকল্লোল মানুষের কবি প্রতিভাকে ফুটাইয়া তোলে। দিগন্তব্যাপী ধানের ক্ষেত, ফুল-ফসলের মেলা— হোগলাবন, কাশবন, তাল-নারিকেল ও গুবাক বৃক্ষের সারি ভাবুক মনে আরো ভাবালুতার ছোঁয়াচ লাগায়। তাই পনেরো শতকের কবি বিজয়গুপ্ত হইতে শুরু করিয়া আজিকার সুফিয়া কামাল, আহসান হাবীব, জয়নুল আবেদীন এবং আরো বহু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সাংবাদিক এ জিলার এক বিশেষ সৃষ্টি। চারণ কবি, মুকুন্দ দাস এবং পুঁথি ও জারীর বয়াতী আলম, আকবর এবং হাস জামানার আবদুল গনির নাম প্রদেশের ঘরে ঘরে প্রচারিত। বরিশালের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এক সময় বিদ্রোহী কবি নজরুল মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বরিশাল শহরকে 'বাঙলার ভেনিস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। এখানকার সবুজ শ্যামলিমায় বিভোর হইয়া গান গাহিয়াছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।

ব্রজমোহন কলেজ ও বিদ্যালয়, আসমত আলী খাঁ ইনষ্টিটিউশন, শর্ষীণা মাদ্রাসা ও লাইব্রেরী, শায়েস্তাবাদ কুতুবখানা, শঙ্কর মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, আনজুমনে হেমায়েত ইসলাম, বিভিন্ন খৃষ্টান মিশন এবং সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সেবা মজলিস এ দেশের ধর্ম, শিক্ষা ও তামদ্দুনিক উন্নয়নে এক বিশেষ ভূমিকায় গ্রহণ করিয়াছে। নদী, সমুদ্র ও অরণ্য প্রকৃতির হিংস্রতা অধিবাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট হইলেও তাহা আদৌ অ-গৌরবের নয়। যুগ যুগ ধরিয়া বান-বন্যার ধ্বংসলীলার মুখে আজো জিলাবাসী টিকিয়া আছে। অতীতে মগ ও ফিরিঙ্গীর বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া তাহারা বীরত্বের স্বাক্ষর আঁকিয়া গিয়াছে ভীমভয়াল মেঘনার সীমাহীন বুকে। তাহারা শীশ দিয়া সাঁতার কাটিয়া পারাপার হয় তেতুলিয়া, কালাবদর, বিশখালি ও বলেশ্বর। বাঘ ও কুমীরের সহিত যুদ্ধ করিয়াই তাহারা এ দেশ আবাদ করিয়াছে। ফলে এ-অঞ্চল আজ প্রদেশের শস্যভাণ্ডাররূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। বিগত দুই দুইটা বিশ্ব-যুদ্ধে এ-জিলার হাজার হাজার নওজোয়ান বীরত্বের খ্যাতি অর্জন করিয়াছে, আরব, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিভিন্ন লড়াই ময়দানে।

যাযাবর পাখি

আ, ন, ম, বজলুর রশীদ

শুচিস্মিতা কাছে এসো এমন নির্জন বেলা
শরতের সস্নেহ দুপুর।
তোমার শ্যামল ছবি রেখাঙ্কিত তন্বীতনু
একখানি রোদে-ভেজা সুর
মন্থর-মধুর। আহা অলজ্জিতা তুমি এই
পৃথিবীর নও,
নির্বাক, তবুও কোন্ নক্ষত্রের স্বপ্ন দিয়ে
কালো চোখে কত কথা কও।
কাছে এসো কথা বলি। তোমাকে দেখেই মন
অকস্মাৎ হয়েছে উধাও
সে কোন্ গ্রহের পথে, উন্মনা উল্কারা
আর অসংখ্য তারাও
চঞ্চল বেদনা-ত্রস্ত। জানো শুচিস্মিতা
আমিও তাদের মতো কেমন অশান্ত যেন।
তুমি সংযমিতা
মাটিতে বেঁধেছ নীড় তাই তুমি মূর্তিমতী
সীমিত রেখায়
একখানি স্বপ্নচ্ছবি এই তৃণে
আর শান্ত নীলের লেখায়
একান্তে অনন্য মনা। সাধ ছিল বাসা বাঁধি
এই পৃথিবীতে
একটু আনন্দ আর উচ্ছ্বাস ও উষ্ণতায়
ঘর ভরে দিতে।
সে স্বপ্ন ভেঙেছি কবে উদাসী নির্মম মুক্ত
নির্লিপ্ত হেলায়
দূরের মানুষ আমি। এখন উঠেছে চাঁদ
নির্জন সন্ধ্যায়
তোমাকে যায় না দেখা, অস্পষ্ট বনের রেখা
রূপালী আবেশ,
তোমার কুটীরে দীপ জ্বলে ওঠে, চেয়ে দেখি
পরিশ্রান্ত তোমাদের দেশ
কেমন ঘুমিয়ে পড়ে। হাত দিয়ে ছুঁতে পারি
এই রাত—মোমের মতন
নরম-কোমল। শোনো শুচিস্মিতা এসেছে লগন
এখন মেলবো পাখা জানিনে কোথায়, তাই
তোমাদের জন্য প্রীতি রাখি
এখানে। হয়ত আর এ-পথে হবে না আসা,
উড়ে যাবো যাযাবর পাখি।

পলাশপুরের ইতিকথা

আল্‌বেরুনী

খালটা রূপোর চন্দ্রহারের মতো চারদিক থেকে জড়িয়ে রেখেছে গাঁয়ের কোমরটাকে। এ খাল ছাড়া যেমন একটা দিনও চলার উপায় নেই গাঁয়ের, তেমনি গাঁ না হলেও কোনো অর্থ হয় না খালটা থাকার। গাঁয়ের প্রাচীনতম বুড়ো মারা গেলেন যিনি এই সেদিন, ফকিরের টিলার ফকির সাহেব, বয়সের যাঁর গাছ পাথর নেই তাঁরাও বল্‌তে পারেন না এ খাল কাটা হয়েছিলো কবে।

কিংবদন্তী আছে সে অনেক বছর আগে গভীর অরণ্যময় ছিল এ-অঞ্চল। হিংস্র শ্বাপদ বাঘ ভালুক ভূত পেত্নী আর দস্যুতস্করদের নিরাপদ রাজধানী। ডাকাতদের হাত থেকে পরিত্রাণ পেলে সামনে এসে দাঁড়ায় ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের দল। হায়াতের জোরে যদি অব্যাহতি পাওয়া যায় এদের কবল থেকে তবে মিছিল করে ছুটে আস্‌বে ভূত আর পেত্নীরা। হাড় মাংসগুলো টেনে ছিঁড়ে খাবে টুক্‌রো টুক্‌রো করে। নানী আর দাদীদের মুখে এ-কাহিনী শুন্‌তে শুনতে কোলের ভেতর আঁৎকে ওঠে আজো গাঁয়ের একান্ত দুরন্ত মিন্টুরা পর্যন্ত। কচিলতার মতো বাহু দু'টো দিয়ে জড়িয়ে ধরে তারা বুড়ীদের সেকেলে সনাতন কংকালগুলো।

ঈসা খাঁ মসনদ আলী প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন রাজধানীতে। পরাজিত করে এসেছেন তিনি মুঘল সেনাপতি রাজপুত বীর মানসিংহকে। তাঁবু ফেল্‌লেন এখানে এই অরণ্যের ছায়ায়। নিদাঘের তপ্ত মধ্যাহ্নটা কাটাবেন প্রকৃতির বুকে। দূর করবেন রণশ্রান্তি।

দলে দলে প্রজারা আসে চারদিকের গাঁ থেকে। ফরিয়াদ জানিয়ে বলে ডাকাতদের অত্যাচারের কথা। দিনের আলোতে মাঠ থেকে গরু বাছুর ধরে নেয়ার কাহিনী। অগণিত বানর আর বন্যশূকরের ফসল বিনষ্টের সংবাদ।

শ্রান্তি আর দূর করা হয় না। দৃপ্ত আরবীয় অশ্বের লাগাম টেনে ধরেন ঈসা খাঁ। ইস্পাতের ঝক্‌ঝকে তলোয়ারটা কোষমুক্ত করেন সশব্দে। সূর্যের তেজে ঝল্‌সে ওঠে একবার। এর আঘাতেই দু'টুকরো করে এসেছেন মুঘল সেনাপতির তরবারী। হ্রেষাধ্বনি আর ক্ষুরধূলি পড়ে থাকে পশ্চাতে। প্রবেশ করেন তিনি দিনের আলোয় অন্ধকার অরণ্যে।

অনেক অনুসন্ধানের পর সন্ধান পান দস্যুদের গোপন আড্ডার। সংগে সংগে ঘিরে ফেল্‌তে চেষ্টা করে তারা তাঁকে চারদিক থেকে। তারপর হিংস্র পশু আর নিরীহ হরিণ শিশুদেরে সচকিত করে শুধু অসির ঝন্‌ঝন্‌।

ফিরে যখন আসেন তাঁবুতে পশ্চিমের আকাশ তখন কারবালার ময়দান। গ্রীষ্মের হাল্‌কা মেঘের সাদা টুক্‌রো-গুলো লাল হ'য়ে গেছে সখীনার উড়নীর মতো। ক্ষত বিক্ষত দেহে অমূল্য জরীর পোষাক রক্তাক্ত। দিগন্তের পারে ঢলে পড়া ক্লান্ত সূর্য্যের মতোই শ্রান্ত তিনি তখন ক্ষুৎপিপাসায়।

পরে দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই দেখা যায় হাজার হাজার সৈনিক লেগেছে জংগল পরিষ্কারে। অর্ধচন্দ্রাকারে ব্যূহ করে বেষ্টন করেছে অরণ্য প্রতিদ্বন্দ্বীরে। চল্লিশজন ডাকাতের পালাতে পারেনি কেউ। কিন্তু প্রাণ দিয়েছে তারা শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়ে। মৃত্যুর আগে আপন বর্শার আঘাতে হত্যা করে গেছে বিশ্বস্ত ক্ষতজর্জরিত অশ্বগুলো পর্যন্ত। তারপর হিংস্র বাঘ, বন্য বরাহ, ভীরু হরিণ, সুচতুর বানর, বিষাক্ত শ্বাপদ। শুধু পরিত্রাণ পায় অশরীরী ভূত পেত্নীরা হাওয়ার রথে পালিয়ে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে প্রাগৈতিহাসিক অরণ্যের ধ্বংস থেকে বেরিয়ে আসে এক প্রাচীন রক্ষা কালীর মন্দির। অভ্যন্তরে কৃষ্ণ পাথরে তৈরী লোলজিহ্বা নৃমুণ্ডমালিনীর ভয়ংকর মূর্তি। বেদী থেকে সিঁড়ি বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে তাজা রক্ত। উপরে এক ছিন্ন শির শিশু। ছিন্ন মস্তার পাদমূল ধরে ভূমি তলে অন্ধকার গুহা। মধ্যাহ্ন সূর্যে সূচীভেদ্য। মশালের আলো ঠিক্‌রে পড়তেই চক্‌চক্‌ করে ওঠে স্তরে স্তরে সাজানো পেতলের ঘড়াগুলো। আকণ্ঠপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা আর সুদৃশ্য মোহরে। মহারাজ অশোক থেকে মহামতি হর্ষবর্ধন, বঙ্গবিজেতা বখ্‌তিয়ার খল্‌জী, গৌড়েশ্বর শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্‌, দিল্লীশ্বর মুহম্মদ বিন তুঘলক, ভারতেশ্বর শাহেনশাহ্‌ আকবর। এ যেনো আরব্য উপন্যাসের আর এক অধ্যায়। কড়া প্রহরায় পাঠিয়ে দে'য়া হয় সব সুবর্ণগ্রামের খাজাঞ্চীখানায়।

তারপর সুন্দর আবাদী জমি। জুড়িয়ে যায় সিপাহী-দের চোখ। হত্যা নয় সৃষ্টির উন্মাদনা ওদের রক্তে। অসির ঝন্‌ঝনানি ভুলে কংকন-কিংকিনীর জন্য উদাস হয় মন। ফিরে যেতে পারে না আর ফৌজে। জংগী লেবাস আর কোষবদ্ধ তলোয়ার ফিরিয়ে দিয়ে আসে সিপাহ-সালারের তোপখানায়। ঘোড়াগুলো ঘোড়াশালে। নতুন করে সৃষ্টি করে তারা আরেক জনপদের।

সংবাদ পেয়ে হাতীর পিঠে সোনার হাওদায় বেড়াতে